পরিণীতা

যুথিকা বড়ুয়া

(১)

আজ গুড-ফ্রাইডে। ইউনিভার্সিটি, লাইব্রেরী সব বন্ধ। এর পর শনি-রবি দু'দিনই ছুটি। অখন্ড অবসর। কোথাও গিয়ে যে একটু ঘুরে আসবে, তারও উপায় নেই। হষ্টেলের গন্ডি ছেড়ে বাইরে বেরুনোই নিষিদ্ধ। তন্মধ্যে কি সাংঘাতিক গরম। উফ্ঃ, অসহ্য। হষ্টেলের চার-দেওয়ালের বদ্ধ ঘরে দম বন্ধ হবার যোগার। গুমোট মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। একটু হাওয়া নেই, বাতাস নেই, পশু-পাখীর কলোরব নেই। গাছের একটা পাতা পর্যন্তও নড়ছে না। যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে গোটা পৃথিবীটা। সকাল-সন্ধ্যে মালুমই হচ্ছে না। - "ধুৎত্তোরি, এরকম ওয়েদার ভালো লাগে কারো! বিছছিরি!"

মনে মনে বিড়বিড় করতে করতে রুম থেকে বেরিয়ে আসে জয়ন্তি। গিয়ে দাঁড়ায় ব্যাল্কনিতে। তবু শান্তি পায় না। ভিতরে ভিতরে অস্বস্তিবোধ করে। কিচ্ছু ভালো লাগছে না। ক'দিন যাবৎ মনটা কেমন আনচান করে উঠছে। আবার কখনো কখনো এক ধরণের শূন্যতাবোধে বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠছে। মনে হচ্ছে, কি যেন একটা ওর হারিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না।

হষ্টেলের পিছন দিকটা বেশ শান্তিপূর্ণ, নিড়িবিলি জায়গা। ছুটির দিনে হষ্টেলের ছাত্র-ছাত্রীরা উন্মুক্ত নীল সামীয়ানার নীচে নিঝুম পরিবেশে গভীর মনোযোগ সহকারে বসে বসে পড়াশোনা করে। কেউ কেউ অবকাশ যাপনে দলবদ্ধভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে গল্প-গুজব করে, আড্ডা দেয়। কিন্তু আজ পালা করে সবাই ব্যাটমিন্টন খেলছে। দেখতে দারুণ লাগছে জয়ন্তির। বিশাল জায়গা। বিস্তর প্রান্তর জুড়ে রোজ-গার্ডেন। গার্ডেনের চারিধারে সারি সারি দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়া গাছ। পাঁচতলার উপর থেকে মনে হচ্ছে, গাছগুলি লাল আর হলুদ ফুলে আবৃত হয়ে আছে। গাছের পাতাগুলি ঝুরুঝুরু মিহিন বাতাসে এলোপাথাড়ি দুলছে। তারই এক পাশে নায়গ্রার জলপ্রপাতের মতো শন্‌শন্ শব্দে প্রবল বেগে অনবরত বইছে ঝর্ণার জল।

হঠাৎ সেই শন্‌শন্ শব্দের প্রতিঃধ্বনীতে এক শূন্য নিবিড় নিস্তব্ধতায় গভীর তন্ময় হয়ে ডুবে যায় জয়ন্তি। যেদিকে দু'চোখ যায়, সর্বত্রই যেন এক অভিনব বৈচিত্র্যের সমাহার, অভিনবত্বের পসরা। যা দেখে সবই নতুন লাগে। সমগ্র পৃথিবীটাই যেন এক অভাবনীয় বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যে ঘেরা, অপূর্ব। সে এক অনবদ্য আনন্দ উপভোগ করার মতোই একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্য। যার চারিধারে বর্ণনাতীত ভালোলাগার উপাদানে আচ্ছাদিত এবং সমৃদ্ধ। বিস্ময়ে অভিভূত জয়ন্তি উন্মুক্ত অন্তর মেলে আস্বাদন করতে থাকে, প্রকৃতির চমকপ্রদ রূপ আর রং। কল্পনায় বিচরণ করে, এক শূন্য নিবিড় নির্জন ভুবনে। যেন স্বর্গোদ্যান। আহা, কি নিদারুণ, কোমল সেই অনুভূতি। ছুঁয়ে যায় ওর হৃদয়পটভূমি। শীতল হয় হৃদয়-মন-প্রাণ, সারাশরীর। আত্ম মুগ্ধতায় ওকে চুম্বকের মতো আবিষ্ট করে রাখে। চোখের পলক পড়ে না। আর সেই একটানা তীব্র ভালোলাগা আর মুগ্ধতার আমেজ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে ওর দেহে এবং মনে। জমে ওঠে হাজার প্রশ্নের ভীঁড়। সে এক ব্যাখ্যাতীত ভাবনার উৎপত্তি হয় ওর মস্তিস্কের মধ্যে। কিছুতেই ভেবে কূল পায় না, ওতো প্রায়শই ব্যাল্কনিতে দাঁড়িয়ে রোজ-গার্ডেন অবলোকন করে। নজর বুলিয়ে গার্ডেনের চারিদিকে পর্যবেক্ষণ করে। কোন কোনদিন গার্ডেনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে। গল্পের বই পড়ে। কই, কখনো তো এমন অনুভূতি জাগ্রত হয় নি ওর। এমন ভাবান্তর আগে তো কোনদিন হয়নি। প্রতিদিনই তো সকাল হয়, দূপুর আসে। তারপর গোধূলী এবং সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে রাত আবার ফিরে চলে যায় ভোরে। ঊষার প্রথম সূর্য্যের

স্নিগ্ধ কোমল আলোয় দিগন্ত জুড়ে বিকশিত করা একটি নতুন সকালে। আবার সব সকাল, দূপুর, সন্ধ্যে এবং রাত কখনো এক হয় না। তরুণ তাপসের মতো কখনো উজ্জ্বল রৌদ্রখরদ্বীপ্ত সোনালী আকাশ, কখনো ম্লান, কখনো বা ধোঁয়াটে। এতে মানব মনেও প্রভাব পড়ে, প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষের জীবনকেও করে নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতির সাথে মানব মনের এ এক নিবিড় সম্পর্ক।
কিন্তু তাতে কখনো কিচ্ছু এসে যায় নি জয়ন্তির। মুহূর্তের জন্যও মনকে কখনো মলিন ম্রিয়মান করেনি। কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখা দেয় নি। বরং ওতেই বিলীন হয়ে যেতো। ও'তো বরাবরই নিরবিচ্ছিন্ন একাকী সন্ধ্যায় ঘরের নিঃভৃতে কোণে নির্জনতা ও নিস্তব্ধতায় একলা থাকার ভালোলাগাটুকুই শুধু একান্তে নিবিড় করে পেতে চেয়েছিল। গহীন অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। তাতেই ছিল ওর সুখ, আনন্দ। এতকাল তা-ই হয়ে এসেছে। অথচ আজকের দিনটা সকাল থেকে কেমন নীরব, নিরুচ্ছাস, বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সূর্য্য দশর্ণের কোনো সম্ভবনা নেই। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। গোধূলীর পূর্বেই ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। এক্ষুণি ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে। অথচ কি আশ্চর্য্য, আজ সেই একাকী সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ বিষন্নময় জগৎ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জয়ন্তি ক্রমশ উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। ওর সবুর সয় না। খাঁচার পাখীর মতো মনটা ওর কেবলই ছটপট করতে থাকে।

হঠাৎ অভাবনীয় ভাবনার জাল বুনতে বুনতে এক সীমাহীন ইচ্ছানুভূতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে জয়ন্তি খুঁজে পায়, জীবনের প্রকৃত অর্থ। আবিস্কার করে, বেঁচে থাকার একটি নতুন উপকরণ। আজ যেন ও' প্রকৃতিতেই সম্পূর্ণ বিসর্জিত। নিয়তির কাছে আত্ম সমর্পিত। স্বপ্নের কাছে ধরাশায়ী। যেন নিবেদিত প্রাণ। মন-বাসনার প্রকোষ্টে কারাবন্দি। ইচ্ছে করছে, শূন্য গগনে উড়ে যাওয়া মুক্ত-বিহঙ্গের মতো দূর নীলিমায় হারিয়ে যেতে। পুর্ণোদ্যমে খুশীর পাল তুলে জীবন জোয়ারে ভেসে বেড়াতে। মন-মানসিকতার কি অদ্ভুদ বৈপরীত্য ওর। ভিতরে ভিতরে সেই ভালোলাগার মধুর আবেশ হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। টের পায়, মনের মধ্যে রস সঞ্চার হবার একটা তীব্র অনুভূতি। কি নিদারুণ একটা শিহরণ। রক্তের স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ে ওর সারা শরীরে। শুনতে পায় প্রাণস্পন্দন। যা কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপ্ত করে। বিকশিত করে। আর সেটা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে গিয়ে জয়ন্তি হারিয়ে যায়, এক অভাবনীয় কল্পনার সাগরে, এক স্বপ্নময় জগতে। যেদিন শরীরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে জীবনে প্রথম অনুভব করে, অত্যাশ্চর্য্যজনক এক অভিনব অনুভূতি।

তৎক্ষণাৎ মানসিক অবসাদ ঝেড়ে ফেলে সদ্য প্রস্ফূটিত ফুলের মতো জয়ন্তি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। নদীর উত্তাল তরঙ্গের মতো পুলক জাগা শিহরণে দোল খায় ওর হৃদয়-মন-প্রাণ-সারাশরীর। চোখমুখ থেকেও ঝোরে পড়ে উচ্ছাস, আবেগ। হঠাৎ স্বগতোক্তি করে ওঠে,-"এর নামই কি ভালোবাসা! ভালোবাসায় এতো সুখ, এতো আনন্দ! তবে কি ও' সত্যিই প্রফেসার শুভেন্দুর প্রেমে পড়ে গেল না কি!"

অথচ আজও মনে পড়ে, মায়ের সাথে ওর তুমুল বাকযুদ্ধ, মতান্তর, আপত্তি, বিরোধীতা। যেদিন শ্রুতিকটূ বাক্যের তীর ছুঁড়ে মনুষ্যজাতির চিরাচরিত রীতি-রেওয়াজ, দু'টি মানব-মানবীর পবিত্র বিবাহ বন্ধনকে দৃঢ়তার সাথে অবাঞ্ছিত বলে মন্তব্য করে বলেছিল,-"কর্তব্যের দোহাই দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া মানেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বির্সজন দেওয়া, বশ্যতার স্বীকার হওয়া, দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করা, করুণার পাত্রী সেজে অন্যের পদতলে আত্মসমর্পন করা, নিরন্তর বোঝা পোড়া, নিজের অক্ষমতাকে প্রকাশ্যে বয়ান করা, নিজেকে অবমাননা করা। যার ফলসরূপ দুঃখের দহনে করুণ রোদনে নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করা, নিঃশ্ব হয়ে যাওয়া। শুধু তা নয়, পারস্পরিক বিশ্বস্থতা এবং সামঞ্জস্যতার একটা ব্যাপার আছে। যা নিতান্তই প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে যার ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে নির্ভরশীল হয়ে আমরণ অটুট থাকে, দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি-আনন্দ এবং ভালোবাসা। নইলে চাওয়া পাওয়ার হিসেব কষতে কষতেই অবলীলায় একদিন অনাদরে ঝড়ে যাবে একটি মাসুম জীবন। সেটাই কি তুমি চাও মামনি? না, না এ হতে পারে না,

কিছুতেই না। রক্তে-মাংসে গড়া মানবীয় হয়ে, আপন সত্ত্বা হারিয়ে, সূঁতোয় বাঁধা অবলা কাঠপুতুলের মতো নীরবে নির্বিবাদে এই ছলনাময় সংসারে বেঁচে থাকা, এ আমি পারবো না। কিছুতেই না। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি মামনি, কোনো পরুষমানুষের গলায় আমায় মালা দিতে বোলো না!"

গর্জে উঠলেন সুধাময়ী, -"এসব তুমি কি বলছ জয়া! সব মিথ্যে, তোমার ভুল ধারণা। পৃথিবীর সব মানুষ, মানুষের রুচী, মনোবৃত্তি সমান নয়। যদি তাই-ই হতো, তবে বহুকাল আগেই সংসার নদীর প্রবাহ থেমে যেতো। বংশ বিস্তার লোপ পেতো। পৃথিবীর জন-মানব শূন্য হয়ে যেতো। মানুষ জীবনে কোনদিনও বড় হতে পারতো না। মানুষের জীবন এতো উন্নতমানের হতো না এবং পৃথিবীর সৌন্দর্য্যও কখনো এতোখানি বৃদ্ধি পেতো না। জীব সৃষ্টির সাথে সাথে জীবন ধারণের নানা উপকরণ এবং ভোগের কৌশল সৃষ্টিকর্তা যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে অনাগত দুঃখ-যন্ত্রণা দূরীভূত করার বহু পন্থাও সৃষ্টি করে রেখেছেন। এতোখানি পড়াশোনা করে তুমি কি এটাই শিখলে!"

অসন্তোষ গলায় বললেন,-"রসায়ন বিজ্ঞান পড়তে পড়তে মাথাটা তোমার একেবারেই গেছে। সারাদিন রিসার্চ করো। বাস করো ভিন্ন জগতে। সেখানে নিজেস্বতার প্রাধান্যে নিজের কর্মসূচীকে এতবেশী গুরুত্ব দাও, পৃথিবীর অন্য কিছু আর তোমার নজরে পড়ে না। তাই বুঝতে পারো না। প্রত্যেক জিনিসের একটা বৈপরীত্য আছে এবং থাকবেও। মনুষ্য জীবন প্রবাহিত নদীর মতো সদা চঞ্চল এবং বহমান। কিন্তু কখনো একইধারায় প্রবাহিত হয় না। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা নিয়েই মানুষের জীবন। শরীর থাকলে ব্যথা-বেদনাও থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। তাকে রোধ করা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেমন সৃষ্টির অমোঘ নিয়মেই ঘটে আবহাওয়ার পরিবর্তন। যখন ধরিত্রীর বুকে নেমে আসে ঘন কালো মেঘের ছায়া, কখনো প্রচন্ড তাপদাহে ঝলসে ওঠা প্রখড় রোদ্দূর, কখনো বা প্রবল বেগে ছুটে আসে ঝড়-বৃষ্টি-তুফান। তেমনি মানুষের জীবনেও সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কাঁন্না অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কোনটাই চিরস্থায়ী নয়। তুমি ভেবো না, সংসার জীবনের পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে সুষ্ঠ এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করবে, নিজের ইচ্ছা মতো জীবনকে পরিচালনা করবে, সেটা কখনোই সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমগ্র নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই একে অপরের পরিপূরক, প্রেরণা শক্তি, শক্তির উৎস। বিশেষতঃ দাম্পত্য জীবনে। সেই সঙ্গে বিধাতার দান সরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা, আদর-স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা বাচ্চা-বুড়ো-জোয়ান, নারী-পুরুষ সবার অন্তরেই বিদ্যমান। কারো বাহ্যিক প্রকাশ পায়, কারো পায় না। কিন্তু ভালোবাসা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না জয়া। যা অন্ন-বস্ত্রের মতো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিতান্ত প্রয়োজন। আর মানুষকে ভালোবাসা-স্নেহ করা, শ্রদ্ধা-ভক্তি করা মনুষ্যজাতির পরম ধর্ম। আর তুমিও সেই মনুষ্য কূলেরই একজন সদস্য। এর উর্দ্ধে তো তুমি নও জয়া!"

কথাটা মনে পড়তেই ঠোঁটদুটো চিপে অস্ফূট হেসে ফেলল জয়ন্তি। শ্বাশত লজ্জা আর আবেগের সংমিশ্রণে চোখদু'টি রাঙা হয়ে ওঠে। একেলা নিরবিচ্ছিন্ন নির্জন সন্ধ্যায় ব্যাল্কনিতে দাঁড়িয়ে গভীর তন্ময় হয়ে ডুবে যায় স্মৃতি রোমন্থনে।

(দুই)

ছোটবেলা থেকেই জয়ন্তি যেমন একরোখা, ধীর-স্থীর-গম্ভীর, তেমনি বিদ্রোহী গোছের মন-মানসিকতা। প্রতিটি ব্যাপারে ওর আপত্তি, অভিযোগ, বিরোধীতা। সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়েই সাংঘাতিক চটে যেতো। একেবারে মিলিটারীদের মতো মেজাজ ছিল। নাকের ডগা দিয়ে একটা মাছি পর্যন্ত কখনো উড়ে যেতে

পারতো না। বিরল সেন্টিমেন্টাল। অনমণীয় ওর জেদ। বিবাহ সে কখনোই করবে না। অথচ সর্বদা নিজের ইচ্ছা এবং চাহিদা হাসিল করে নেওয়াই ছিল জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। বিশেষ করে সৃষ্টিশীলতার তাগিদে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, অন্যের করুণায় নির্ভরশীল হয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা, সেটা ও' কখনোই সমর্থন করতো না। কিন্তু অধ্যাপক পিতা-মাতার শাসন শিক্ষায় বেড়ে ওঠা জয়ন্তির মূল উদ্দেশ্য ও আর্দশ, জীবনে বড় হওয়া, সৎ হওয়া এবং মহৎ হওয়া। চেয়েছিল, মাতা-পিতার স্নেহ-মমতার ছত্রছায়া থেকে সড়ে এসে নিজস্ব মাটিতে শক্ত পায়ে দাঁড়াতে, উচ্চপদ মর্যাদাসম্পন্ন সুপ্রতিষ্ঠায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, স্বাবলম্বী হতে। চেয়েছিল, নিজের মান-মর্যাদা, আত্মসম্মান বজায় রেখে বন্ধনহীন, চিন্তাহীন, মুক্ত -বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে জীবনের সমগ্র জটিলতা থেকে নির্ভেজালভাবে বেঁচে থাকতে। পুরুষ শাসিত সমাজে পূর্ণ মান-মর্যাদায় সমান অধিকারের তালিকাভূক্ত হয়ে পুরুষ মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে একই পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে। জীবনে কখনো হার মানেনি জয়ন্তি, হার মানতে শেখেনি। ওর একমাত্র আশা-আকাঙ্খা মাতা-পিতার ইচ্ছা ও স্বপ্নকে যথাযথ পূরণ করা, সার্থক করে তোলা, জীবনে সফলতা অর্জন করা। আর সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নগুলিকে বাস্তবায়ীত করতেই দৃঢ় মনের অধিকারী জয়ন্তি উচ্চশিক্ষা গ্রহণে পদার্পণ করে দিল্লীর জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটিতে। যেদিন উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সুদর্শণ বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ লেক্চারার শুভেন্দুকে ও' প্রথম দেখেছিল। সেখানেই লেডিস হষ্টেলে থেকে ভবিষ্যৎ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে দিবানিশি নিমগ্ন নিরলস হয়ে ডুবে থাকতো বিদ্যার অথৈ সাগরে। হাসি-মশকরা, আনন্দ-কোলাহল, উৎসাহ-উদ্দীপণা কোনদিকেই ওর আগ্রহ ছিল না, উৎসাহ ছিল না। একদম নিরস, বেরসিক। অথচ তখন ওর সুকোমল যৌবনের প্রথম প্রহর। যেন বাঁধ ভাঙ্গা উত্তাল যৌবন। কি চমকপ্রদ রূপ, লাবণ্য, শরীরের গড়ন। যেন সৌন্দর্য্যের পারিজাত। চির অম্লান, চির সজীব, শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমনীয় নব যৌবন সম্পন্না এক উদ্বিগ্ন অনন্যা। বিধাতা যেন অকৃপণ নিপুণতা ঢেলে ওকে পড়েছিলেন। পূর্ণতায় একেবারে ভরপুর।

কথায় বলে,-"যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপর্শীর ঘুম নেই!"

ভেবে অস্থির হয়ে উঠতো ওর সহপাঠীরা। কেউ কেউ উপহাস করে বলতো,-"বালিকা ব্রহ্মচারী!"
আবার কেউ কেউ ওর রূপের বর্ণনা দিয়ে মন্তব্য করতো,-"পরিণত যৌবনে জীবনকে উপভোগ করবার উপযুক্ত সময়ে তারুণ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে গৃহত্যাগী সাধু-সন্তদের মতো এতখানি আত্মসংযমী হয় কিকরে! আবেগ অনুভূতিও কি নেই ওর শরীরে? জীবনে কোনো স্পৃহাই কি ওর নেই?

কিন্তু আবেগ-অনুভূতিহীন নিরস নিরুচ্ছাস এবং নিস্প্রেম জয়ন্তির ধূসর মরুভূমির মতো হৃদয়াকাশেও যে একদিন ভালোবাসার গ্রহণ লাগবে, প্রেমের পত্তন ঘটবে, তা কে জানতো!

সেদিন ছিল ২৫শে বৈশাখ, বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের জন্ম দিবস। এ উপলক্ষে ইউনিভার্সিটির অডিটোরিয়ামে পূর্ণদ্যেমে প্রস্তুতি চলছিল, এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিশাল আয়োজন। পূর্ব পরিকল্পিত অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই ব্যস্ত। তন্মধ্যে কেউ কেউ চড়ুইভাতির অন্যতম আনন্দ উপভোগে মেতে ওঠে। রেকর্ডে বাজজে রবীন্দ্র সঙ্গীত, কখনো ভক্তিমূলক গান। আনন্দে সবাই মর্শগুল। একমাত্র জয়ন্তিই সবার চে' একটু ভিন্ন ধরণের। সহজে ধরা দেয় না। বিশেষতঃ বন্ধু মহলে। সাধারণত কথা কম বলা ওর অভ্যেস। তন্মধ্যে মহিলাঙ্গনের কোনো ভূমিকা পালন করা কিংবা দায়িত্ব গ্রহণ করা, বান্ধবীদের সাথে অন্ত রঙ্গভাবে মেলামেশা করা, ওসব ওর ধাতে নেই। এক কথায় নিজেকে সর্বত্র গুটিয়ে রাখাই ওর চরিত্রের

একটি প্রধান বৈশিষ্ঠ। পার্শ্বস্থ একটি উঁচু ঢিবির উপর হাঁটুতে মুখ গুঁজে সবার কান্ড দেখছিল বসে বসে। ইতিপূর্বে প্রফেসর শুভেন্দু কখন যে নিঃশব্দে এসে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কেউ টের পায় নি। তিনি হঠাৎ সবাইকে কাঁপিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,-"কি, রান্না-বান্না হ'ল তোমাদের! সাড়ে তিনটে বাজে প্রায়! খাওয়া দাওয়া হবে কখন!"

বলতে বলতে উঁচু ঢিবির দিকে পলকমাত্র দৃষ্টিপাতে থমকে দাঁড়ান। নিজের চোখদু'টোকে যেন বিশ্বাসই হয় না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে জয়ন্তির অভাবনীয় রূপ দর্শণে তিনি পড়ে গেলেন বিস্ময়ের ঘোরে। -এ কি, জয়ন্তি না! আজ হঠাৎ ওর বেশভূষার পরিবর্তন! জিন্সের প্যান্ট-শার্ট বর্জন করে পরিধানে বাঙালি রমণীর চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র তাঁতের শাড়ি। বাহ্, অপূর্ব! সোনালী চওড়া পাড়ের মেরুন রং-এর শাড়িতে অবিকল দূর্গা প্রতিমার মতো দেখাচ্ছে। যেমন দুধসাদা গায়ের রং, তেমনি হরিণাক্ষী দু'টির মায়াবী চাহনি। তন্মধ্যে ওর পৃষ্ঠদেশ জুড়ে লম্বা কালো কোঁকড়ানো রেশমী চুল। চোখ ফেরায় সাধ্য কার। প্রতিটি মানুষকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ঠ করবেই। যেন সাক্ষাৎ দেবী, দেবলোকের বাসিন্দা। ভক্তদের আরাধনায় স্বয়ং নেমে এসেছে মর্তে।

স্বাভাবিক কারণে তৎক্ষণাৎ হাসির ঝিলিক দিয়ে ওঠে ঠোঁটের কোণে। হাসিটা বজায় রেখে প্রসন্ন হয়ে বললেন,-"তুমি ওখানে কেন জয়ন্তি! নেমে এসো! আমি তো থাকতেই পারলাম না! কি চমৎকার গন্ধ বের হচ্ছে রান্নার! স্ম্যাল্ গুড্! কেমন টেনে নিয়ে এলো আমায়, দ্যাখো তো!"

বলে জয়ন্তির সন্নিকটে এগিয়ে গেলেন। হাতটা প্রসারিত করে বললেন,-"দেখো সাবধান, বিকেয়ার ফুল! খুব পিচ্ছল জায়গাটা! স্লীপ্ করতে পারে!"

অপ্রস্তুত জয়ন্তি পড়ে যায় বিপাকে। মনে মনে সংকোচবোধ করে। কি করবে, মনস্থির করতে পারে না। অগত্যা, সলজ্জে হাতটা বাড়িয়ে দিতেই বিদ্যুতের শখ খাওয়ার মতো কেঁপে উঠল ওর সারাশরীর। কেঁপে উঠল ওর হৃদয়স্পন্দন। স্পর্শকাতরতায় লজ্জাবতী পাতার মতো চকিতে রাঙা মুখখানা ওর নূয়ে পড়ল। প্রফেসর শুভেন্দুর উষ্ণ স্পর্শে কি নিদারুণ কোমল একটা শিহরণ খেলে গেল ওর দেহে এবং মনে। যা ক্ষণপূর্বেও কল্পনা করতে পারেনি। কি অদ্ভুত একটা শিহরণ। রক্তের স্রোতের মতো শরীরের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্রে সঞ্চালণ হতে লাগল, এক অভিনব ভালোলাগার তীব্র অনুভূতি। যার বিশ্লেষণমূলক কোনো ব্যাখ্যা তখন ওর জানা ছিল না। জানা ছিল না, আচমকা বিপরীত লিঙ্গের অঙ্গ স্পর্শে ওর হৃদয়পটভূমি তোলপাড় করে দেবে, আলোড়ণ সৃষ্টি করবে।

মুহূর্তের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ঠ হয়ে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তির কণ্ঠস্বর। অপ্রত্যাশিত প্রফেসর শুভেন্দুর আগমন, উপস্থিতি এবং তার অমায়িক আন্তরিকতার অভিব্যক্তিটুকু ওকে বেশ কিছুক্ষণ বুঁদ করে রাখে। কিন্তু এর অন্তর্নিহীত তাৎপর্য প্রকাশ্যে ধরা না পড়লেও আবেগের প্রবণতায় জয়ন্তি পারে নি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। ক্ষণিকের কোমল আনন্দানুভূতিটুকু ধারণ করতে। মুগ্ধ আকর্ষণে তৎক্ষণাৎ দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে, এক অবিচ্ছেদ্য টান, এক অদৃশ্য বন্ধন। যা ওর আত্মার সাথে আষ্টে-পিষ্ঠে জড়িয়ে পড়ে। ভিতরে ভিতরে সিক্ত হয়ে ওঠে ওর তন মন সারাশরীর। চোখ তুলে তাকাতেই পারে না। শাঁড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে দৌড়ে চলে যায় হষ্টেলের দিকে। নিজের রুমে ঢুকে শুয়ে পড়ে বিছানায়। শুয়ে শুয়ে আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতে কখন যে সন্ধ্যে ঢলে পড়েছে, খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ বাদ্যযন্ত্রের অপূর্ব মূর্ছণা কর্ণগোচর হতেই শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন ওর চাঙ্গা হয়ে উঠল।

তৎক্ষণাৎ দ্রুত ফ্রেস হয়ে, ড্রেস-আপ করে গিয়ে ঢুকে পড়ে অডিটোরিয়ামে। ততক্ষণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। একের পর এক মঞ্চস্থ হচ্ছিল, নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য, কাব্য-জলসা এবং কবিতার আসর। সব মিলিয়ে অত্যন্ত চমকৃতভাবে সমগ্র কলা-কূশলীদের দুর্দান্ত পরিবেশনায় সমগ্র দর্শক-শ্রোতাদের চুম্বকের মতো আবিষ্ট করে রাখে। ইতিমধ্যেই ঘটে গেল একটা অঘটন।
হঠাৎ বিজলীবাতী নিভে গিয়ে সৃষ্টি হয়, এক অভাবনীয় বিরূপ বিশৃঙ্খল পরিবেশ। যার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে যায়। চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুরু হয় ছাত্র-ছাত্রীদের হৈ -হুল্লোড়, হুড়োহুড়ি, ছোটাছুটি।
এমতবস্থায় জয়ন্তি অন্ধের মতো পথ অনুসরণ করে ব্যাক্-ডোর দিয়ে দ্রুত ছুটে বেরিয়ে আসতেই সিঁড়ির গোড়ায় প্রফেসর শুভেন্দুর সাথে লাগল এক ধাক্কা। বেশ জোরেই লেগেছিল ধাক্কাটা। ছিটকে দুজনে পড়ল গিয়ে তিনহাত দূরে। কিন্তু অঙ্গ স্পর্শের অনুভূতিতে দুজনেরই বোধগম্য হয়, বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিটিকে। প্রফেসর শুভেন্দু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,-"সরি ম্যাডাম, আই এ্যাম সো সরি! আর ইউ ওকে?"

জয়ন্তি নিরুত্তর। অপ্রত্যাশিত প্রফেসর শুভেন্দুর কণ্ঠস্বরে ওর সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। যেদিন ও' প্রথম অনুভব করেছিল, মানব দেহের উষ্ণ স্পর্শের এক অভিনব অনুভূতি। কি নিদারুণ সেই অনুভূতি। যা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। সম্পূর্ণ নতুন বিস্ময়। সে এক নতুন চেতনা। কিন্তু তখন ওর শোচনীয় অবস্থা। মৌনতা ও বিমূঢ়তায় কি বলবে, ভাষা খুঁজে পায় না। লজ্জা আর আবেগের সংমিশ্রণে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে অন্ধের মতো হাতরে হাতরে পথ খুঁজতে থাকে। কিন্তু প্রফেসর শুভেন্দু? তার মধ্যে কি কোনো প্রতিক্রিয়াই ঘটেনি?
অবশ্যই ঘটেছিল। ক্ষণিকের অনাকাঙ্ক্ষিত বিভ্রান্তিতে ক্ষণপূর্বে যে কান্ডটি ঘটে গেল, তার জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল। কিছু বলার ব্যাকুলতায় প্রচন্ড উদগ্রীব হয়ে উঠছিল। অজানা এক আকর্ষণে মনকে বার বার দুর্বল করে দিচ্ছিল। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্যের বহিঃপ্রকাশ তাৎক্ষণিক ধরা না পড়লেও অপ্রত্যাশিত যুবতী রমণীর কোমল সান্নিধ্য এবং অঙ্গ স্পর্শের এক অভিনব অনুভূতিতে প্রফেসার শুভেন্দুর সুকোমল হৃদয়কে যে ভিজিয়ে দিয়েছিল, তা কে জানতো।
অথচ মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান। আকস্মিক থমকে যাওয়া কয়েকটি মুহূর্তে দুজনার উষ্ণ নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাসের আনা গোনার মধ্যেই ঝট্ করে জ্বলে ওঠে বিজলীবাতী। প্রফেসর শুভেন্দু লক্ষ্য করলেন, স্পর্শকাতরতায় লজ্জাবতী পাতার মতো মাথাটা নূয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল জয়ন্তি। যেদিন তুমুল ঝড়ে হৃদয়পটভূমিকে ওর তোলপাড় করে দিয়েছিল। বারবার ক্ষণপূর্বের স্মৃতি ওকে বিচলিত করে তুলছিল। যেদিন পুলক জাগা শিহরণে জীবনে প্রথম দোলা দিয়ে উঠেছিল জয়ন্তির মন-প্রাণ সারা শরীর। জাগ্রত হলো, এক অভিনব কোমল অনুভূতি। সিক্ত হয়ে উঠল, ওর ধূসর মরুভূমির মতো হৃদয়পটভূমি। যেদিন শরীরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে জীবনে প্রথম আবিস্কার করেছিল জয়ন্তি, জীবনের প্রকৃত অর্থ এবং ভালোবাসার সারমর্ম। জেগে ওঠে বেঁচে থাকার সাধ, ভালোবাসার ইচ্ছা, ভাবাবেগ-অনুভূতি। যা কখনো দৃষ্টিগোচর হয় না। গহীন অনুভূতি দিয়েই শুধু অনুভব করা যায়। আর সেদিন থেকেই প্রফেসর শুভেন্দুকে একান্ত করে কাছে পাবার ইচ্ছা ওকে ক্রমশ উৎসুক্য করে তোলে।

কিন্তু সূর্য্য কি এতদিন পশ্চিমদিকে উঠেছিল? না আকাশের চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রগুলি সব মেঘে ঢাকা ছিল! না কি বসন্তে ফুলই ফোটেনি বাগিচায়। স্রষ্টার পরিচালনায় বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের সবকিছুই রীতিমতো একইভাবেই চলছে। প্রকৃতির রূপ, বৈশিষ্ঠ কিছু তো বদলায় নি।
তবে আজ হৃদয় আঙ্গিনার কেন এমন বিবর্তন জয়ন্তির! কেন ইবা এমন অস্থিতিশীলতা! কখনো উচ্ছলতা, কখনো ঔদাসীন্যতা, কখনো মলিনতা, কখনো চঞ্চলতা। পূর্বে কখনো তো এমন ঘটেনি। অথচ নিজেকে

সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চরম দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার বদ্ধ জয়ন্তি, মাতা-পিতার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অদূরে পড়ে থাকার বুকভাঙ্গা কষ্ট আর বেদনাগুলিকে বেমালুম ভুলে গিয়ে একান্তে নিঃভৃতে গভীর তন্ময়ে নিমজ্জিত হয়ে থাকে, প্রফেসর শুভেন্দুকে সেই নীরব ভালোলাগার আবেশ এবং ভালোবাসার ইচ্ছানুভূতির অবগাহনে।
কিন্তু কতক্ষণ! বাইরের পৃথিবীর বুকে আঁধার নেমে এলেই ওর হৃদয় আকাশেও অন্ধকারে ছেয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। মনই টিকতে চায় না। হষ্টেলের রুটিনমাফিক জীবন আজ ওর একঘেঁয়ে লাগে। অপেক্ষা করে থাকে, কখন রাত পোহাবে, স্নিগ্ধ সতেজ হয়ে ফুটে উঠবে ঊষার প্রথম তরুণ সূর্য্যের কোমল নির্মল আলো।

(৩)

ঢং ঢং করে ঘড়ির ঘন্টার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় জয়ন্তির। ধড়ফড় করে ওঠে। চোখ মেলে দ্যাখে, সকাল হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। পূর্ব দিগন্তের প্রভাতরবির কোমল রক্তিমাভার কণা কৃষ্ণচূড়ার গাছের ফাঁক দিয়ে জানালার পর্দা ভেদ করে ঢুকে পড়েছে ওর বিছানায়। সোনালী রৌদ্রে ঝলমল করছে চারদিক। বাইরে ঝুরু ঝুরু মিহিন বাতাস বইছে। গাছের পাতাগুলি হাওয়ায় এমনভাবে দুলছে, মনে হচ্ছে যেন রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলছে। কখনো ছায়া, কখনো রৌদ্র।

তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্ত মনে বিছানা ছেড়ে নেমে আসে জয়ন্তি। প্রতিদিনকার মতো সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেড়ে বাথরুম থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছে। হঠাৎ টেলিফোনটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে ওঠে। মনে মনে বলল,-বাব্বা, সাত-সকালেই টেলিফোন! খুব জরুরী তলব মনে হচ্ছে! কিন্তু করল কে! নিশ্চয়ই মামনিই করেছে!

এইভেবে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসে পুরুষ কণ্ঠস্বর।

-"হ্যালো!"

-"হ্যালো, কে বলছেন!"

-"কংগ্রেজুলেশন্স্ জয়ন্তি! আমি শুভেন্দু স্যার বলছি, কেমন আছো!"

নাম শোনামাত্রই বুকটা ধুক্ করে কেঁপে উঠল জয়ন্তির।-কে, শুভেন্দু স্যার! ওকি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে না কি! আশ্চর্য্য, গতকাল শুভেন্দু স্যারকেই তো সারারাত ও' স্বপ্নে দেখেছিল! সেই কত কথা, কথার আলাপন, কত হাসি-কলোতান স্যারের সাথে। তার রেশ যেন এখনো কাটে নি।

একেই বলে সংযোগ। তবু নিজের কানদুটোকে বিশ্বাস হয় না। বিস্ময় আর খুশীর সংমিশ্রণে মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তি। কিছুক্ষণ থেমে একটা ঢোক গিলে বলল,-"কে-কেমন আছেন স্যার!"

-"আমি ভালো আছি জয়ন্তি! ভাবলাম, অযথা টেনশনে রাখা কেন, শুভ সংবাদটি তোমায় এবার দিয়েই দিই!"

কিন্তু শুভ সংবাদটি যে কি, তা আর বোঝার অপেক্ষা রাখে না জয়ন্তি। তৎক্ষণাৎ সীমাহীন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তবু শুভেন্দু স্যারের মুখ থেকে শুভ সংবাদটি শোনবার ইচ্ছাটুকু কিছুতেই সম্বরণ করতে পারে না। অনবগত হয়ে খানিকটা বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইল,-"কি সংবাদ স্যার?"

সহাস্যে প্রফেসর শুভেন্দু বললেন,-"আই এ্যাম ভেরী গ্যান্ড্ টু সে, ছাত্রীদের মধ্যে একমাত্র তুমিই সিন্সিয়ার, ব্রিলিয়ান্ট, এ্যান্ড ভেরী ইন্টেলিজেন্ট্। উই নো এ্যান্ড হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিওর দ্যাট, ইউ উড্ উইন এ্যান্ড সাক্সেস ইন ইওর লাইফ্। প্রিন্সিপাল সাক্সেনার রিকমেন্ডেই তোমার স্কলারশীপ্ গ্রান্ড্ হয়ে গেছে। তুমি খুব শীঘ্রই রসায়ন বিজ্ঞানে পি.এইচ্.ডি করতে বিলেত যাচ্ছো জয়ন্তি। উই আর সো প্রাউড অফ্ ইউ। এভ্রিথিং হ্যাজ বিন্ কন্ফার্মড্! বি রেডি নাও! সি ইউ, বাই!"

মুহূর্তে সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল জয়ন্তির। অব্যক্ত আনন্দে স্পীচ্লেস হয়ে পড়ে। একেলা নীরব নির্জনতা ও গাঢ় নিস্তব্ধতায় কক্ষচ্যুত উল্কার মতো হষ্টেল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে রোজ-গার্ডেনে। একটি বেঞ্চিতে চুপটি করে বসে পড়ে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে হাঁপাতে থাকে। তখনও কানে বাজে, ক্ষণপূর্বের টেরিফোনে অন্তরঙ্গ আলাপনের প্রফেসর শুভেন্দুর আবেগপ্রবণ পুরুষালী কণ্ঠস্বর। ছড়িয়ে পড়ে মস্তিস্কের কোষে কোষে। প্রতিবিম্বের মতো ধীরে ধীরে ওর মনঃশ্চক্ষে ভেসে ওঠে, চড়ুইভাতির অন্যতম আনন্দের সেই দৃশ্যপটের একখন্ড অম্লান স্মৃতি আর প্রফেসর শুভেন্দুর সাথে অন্ধকার কক্ষে যুগলবন্দী হয়ে থাকার কয়েকটি মুহূর্ত। যা কখনো ভোলার নয়। একদিকে বিদেশ গমনের অপরিসীম আনন্দ, উল্লাস, অন্যদিকে ইউনিভার্সিটির বন্ধু-বান্ধব সকলকে ছেড়ে যাবার বিচ্ছেদ-বেদনা। স্পেশালী প্রফেসর শুভেন্দুকে।

ভাবতেই বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল জয়ন্তির। কোমল বেদনায় ছেয়ে গেল ওর শরীর এবং মন। অথচ ক'মাস আগেও যিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজানা, অচেনা একজন অজ্ঞাত কূলশীল ব্যক্তি। যিনি রসায়ন বিজ্ঞানের গবেষক। সারাদিনের বেশীরভাগ ল্যাব্রোটারীতেই পড়ে থাকেন। একাগ্রহে রির্সাচ করেন বসে বসে। তখন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের মানুষ। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কখনোই কর্ণগোচর হবে না। ওঁর নাগাল পাওয়াই দুস্কর। পাবার সম্ভাবনাও নেই। আর পেলেই বা, প্রফেসর শুভেন্দুর হয় কে ও'? ওঁর সাথে সম্পর্কই বা কিসের? একজন শিক্ষক আর ছাত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকুই। এর বাইরে তেমনভাবে আলাপচারিতা তো দূর, মনের মধ্যে সেরূপ চেতনাও আগে কোনদিন ওর উদয় হয় নি! কিন্তু আজ এ কি ঘটে গেল জয়ন্তির জীবনে! ইট্ ইস্ আনথিংকেবল, আন্বিলিভএব্!

আসলে, মানুষের মন বড় বিচিত্র। শতচেষ্টা করেও পোষ মানানো যায় না। সুযোগ পেলে উড়ে পালাবেই। তদ্রুপ পুলক জাগা শিহরণে নদীর উত্তাল তরঙ্গের মতো জয়ন্তির হৃদয়-মন-প্রাণ সারাশরীর দুলে ওঠে। জাগ্রত হয়, অত্যাশ্চর্য্যময় এক অভিনব অনুভূতি। যার নাম ভালোবাসা।

(চার)

হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল জয়ন্তি। ওর মধ্যে ভর করে বসলো প্রেম নামক এক অদৃশ্য ভূত। কারণে অকারণে বহুবার প্রফেসর শুভেন্দুর সংস্পর্শে যাবার সুযোগগুলিকে ক্রমে ক্রমে সদব্যবহার করতে লাগল

কিন্তু কিছুতেই পারেনা নিলর্জ্জ বেহায়ার মতো ইউনিভার্সিটির নির্জন নিড়িবিলির অলিতে-গলিতে ধর্ণা দিয়ে শুভেন্দু স্যারের মনের ঠিকানা খুঁজে বের করতে, তাঁকে বিভ্রান্ত করতে। বিচিত্র মুখাবয়বে ও অঙ্গ-ভঙ্গিমায় মনের ভাব প্রকাশ করতে, ভালোবাসার সংকেত প্রেরণ করতে। কিন্তু পারেনি। নিজের কামনা-বাসনা গুলিকে অন্তরের অন্তঃপুরে পুষে রেখে গহীন অনুভূতি দিয়ে দৃঢ়ভাবে শুধু এটুকুই উপলব্ধি করে, মায়ের উদৃত ভবিষ্যৎবাণী নিতান্তই বাস্তব সত্য। মানুষ সত্যিই ভালোবাসার পূজারী। সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে বসন্ত ঋতুতে বাগিচায় যেমন ফুল ফোটে, তেমনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের হৃদয়পটেও জন্ম নেয় ভক্তি-শ্রদ্ধা-আদর-স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসা। সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতি যে ধারণা মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে পোষণ করেছিল, তা সম্পূর্ণ ভুল, মিথ্যে। আর সেই মিথ্যে আবরণ মনের মণিকোটা থেকে সড়ে যেতেই জয়ন্তির সুকোমল হৃদয়পটভূমিতে জন্ম নেয় মায়া-মমতা প্রেম-ভালোবাসা। সী ইস্ ইন লাভ। প্রফেসর শুভেন্দুকে ও সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে। হ্যাঁ, প্রফেসর শুভেন্দুকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে জয়ন্তি। প্রেম সমুদ্রের অতল তলে ও' হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু আজ এর কিইবা মূল্য আছে! এ তো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অর্থহীন।

অবলীলায় নিজের ইগোর কাছে পরাস্ত হয়ে সংকল্পচ্যুত এবং আবেগ-অনুভূতিহীন জয়ন্তির নিরস নিস্প্রেম হৃদয়ে যে ভালোবাসার জন্ম নিয়েছিল, তা অঙ্কুর হয়ে গজিয়ে ওঠার পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে যায়। জয়ন্তি পারে নি, তা বাঁচিয়ে রাখতে। আর সেই অপারগতা এবং ব্যর্থতার কারণে একরাশ মনোবেদনা নিয়ে জয়ন্তি অচীরেই পৌঁছে যায়, ওর পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের দেশ লন্ডন, ইংল্যান্ড। যেদিন স্কলারশীপ্ নিয়ে রসায়ন বিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি করতে বিদেশ যাত্রার শুভ মুহূর্তে প্রফেসর শুভেন্দু একগোছা রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে জয়ন্তিকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন বিমান বন্দরে। অপ্রত্যাশিত যার দর্শণে এবং আগমনে নিবিড়তম আনন্দে জয়ন্তি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেও ভিতরে ভিতরে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারে নি। পারেনি স্বেচ্ছায় নিজেকে ধরা দিতে।
অগত্যা, শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে মনে মনে ভাবে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখের নিমেষে আকাশ পাড়ের দূর নীলিমায় অদৃশ্য হয়ে যাবে। হয়তো কোনদিনও আর দেখা হবে না। হবার সম্ভাবনাও নেই। জীবনে চলার পথে ক্ষণিকের সীমাহীন সঞ্চিত ভালোলাগা আর ভালোবাসাটুকুই শুধু রয়ে যাবে ওর স্মৃতির গ্রন্থিতে, অদৃশ্য এক অনুভূতিতে।
অথচ মাত্র কয়েক ফুট দূরত্বের ব্যবধানে প্রফেসর শুভেন্দু দাঁড়িয়ে ছিলেন। সপ্রশংস দৃষ্টি হেনে অস্ফূট স্বরে শুধু বলেছিলেন,-"আমরা আশাবাদী জয়ন্তি। উর্ত্তীণ তুমি হবেই! ভালো থেকো।"

ইতিপূর্বে জয়ন্তির গভীর সংবেদনশীল দৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই ছাপা অক্ষরের মতো না বলা কথাগুলি যেন সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আর তৎক্ষণাৎ প্রফেসর শুভেন্দু মুহূর্তের জন্য কেমন বিচলিত হয়ে উঠলেন। মনকে দুর্বল করে দিলেও এক মুহূর্তও আর দাঁড়ালেন না।-"ও.কে জয়ন্তি, বেষ্ট অফ্ লাখ।"
বলে অবিলম্বে বিমান বন্দর থেকে প্রস্থান করলেন।

জয়ন্তি নির্বিকার। অসহায় ওর দৃষ্টি। লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে প্রফেসর শুভেন্দুকে যতক্ষণ দেখা গেল, সেদিকেই চেয়ে থাকে। হঠাৎ চোখের আড়াল হতেই মনে মনে নিজেকে শান্তনা দেয়, একান্ত আপন করে, নিঃভৃতে নিবিড় করে নাই বা পেলাম, তবু আভিজাত্যসম্পন্ন এবং মার্জিত পুরুষ শুভেন্দু স্যারের অকৃত্রিম হাসির স্মৃতিটুকুই চিরদিন জড়িয়ে থাকবে ওর অনুভূতিতে। এও কি কম! এ তো কল্পনারও অতীত! কিন্তু তা কতদিন! হয়তো লন্ডনে পৌঁছেই নানান ব্যস্ততায় ধীরে ধীরে ভুলে যাবে প্রফেসর শুভেন্দুকে। ভুলে যাবে ওর অতীতকে। একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে সব মুছে যাবে ওর স্মৃতির পাতা থেকে।

কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। ইংল্যান্ডে পৌঁছেও জয়ন্তি পারে নি প্রফেসর শুভেন্দুকে ওর হৃদয় থেকে অপসারিত করতে, তাঁকে ভুলে যেতে। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও দিনের শেষে একখন্ড অবসরে গভীর তন্ময় হয়ে বিচরণ করে, ওর মনগড়া এক স্বপ্নলোকে, এক নতুন পৃথিবীতে। যেখানে শুধু ওরা দুজনই একমাত্র বাসিন্দা। ততক্ষণে পশ্চিম দিগন্ত বিস্তৃত উজ্জ্বল রেশমী আলোয় আবির্ভূত হয় পূর্ণিমার চাঁদ। সেই জোৎস্না রাতের উজ্জ্বল আলোয় সমস্ত কানন যখন অপরূপভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে, বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসের সুগন্ধ্যে নিমজ্জিত জয়ন্তি বারান্দার রেলিং-এ দাঁড়িয়ে অনুভব করে, ওর সুকোমল অঙ্গে মৃদুস্পর্শে হস্ত সঞ্চালণ। ফিস্ ফিস্ শব্দ। কানে কানে কে যেন কি বলছে। ক্রমশ সেই শব্দ আর সেই নিদারুণ কোমল অনুভূতি শরীরের সাথে লীন হতে থাকে। জয়ন্তি দুচোখ বন্ধ করে, উন্মুক্ত অন্তর মেলে আস্বাদন করতে থাকে, ক্ষণিকের সঞ্চিত সেই ভালোলাগার মধুর আবেশ। ছুঁয়ে যায় ওর হৃদয়পটভূমি। শিহরিত হয় সারাশরীর। রুদ্ধ হয়ে আসে ওর কণ্ঠস্বর। না জানি কতক্ষণ!

এমনি করেই নীরব নিস্তব্ধতায় পোহায়ে যায় কত অগণিত প্রহর। ততক্ষণে নিদ্রাদেবীর বাহুমন্ডলে ঢলে পড়ে আকাশ বাতাস গোটা পৃথিবী। গভীর নিশুতি রাত। ঘুমন্ত শহর। চারিদিকে নিঝুম, নিস্তব্ধ। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে, পশ্চিম প্রান্তর জুড়ে নীলাভ জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। আর সেই দিগন্ত বিস্তৃত জোৎস্নার মধ্যেই ক্রমশ জীবন্ত হয়ে ওঠে, প্রফেসর শুভেন্দুর শান্ত স্নিগ্ধ মুখমন্ডল। ক্ষীণ শব্দে কর্ণগোচর হয়, তাঁর দরাজ পুরুষালী কণ্ঠস্বর। ধীর পায়ে ওর অতি সন্নিকটে এগিয়ে আসে। মধুর প্রেম-আহ্বানে প্রসারিত করে দেয় তাঁর বলিষ্ঠ বাহুদ্বয়। ধুক্‌ধুক্ করে জয়ন্তির বুক কাঁপে। ঠোঁট কাঁপে। ততক্ষণে লজ্জাবতী কনের মতো একহাত ঘোমটার আড়ালে চমকিত জয়ন্তি শ্বাশত লজ্জায় নূয়ে পড়ে, পশমাবৃত প্রফেসর শুভেন্দুর প্রশস্ত বক্ষপৃষ্ঠে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় জয়ন্তির। চোখ মেলে দ্যাখে, ও' বিছানায়। সকাল হয়ে গিয়েছে সেই কখন। বেলা দশটা বাজে। তবে কি এসব স্বপ্ন দেখছিল ও' এতক্ষণ!
মায়ের মুখে শুনেছে, ভোর বেলার স্বপ্ন কখনো বিফলে যায় না। কিন্তু তাই বা সম্ভব হবে কেমন করে! ইম্পসিবল্!
মনটা বিষন্নতায় ছেয়ে যায় জয়ন্তির। উঠতেই ইচ্ছে করছে না বিছানা ছেড়ে। আর উঠেই বা করবে কি! অল্ এ্যাক্সজামিনস্ হ্যাজ বিন ডান। শুধু রেজাল্ট আউটের অপেক্ষা মাত্র। কিন্তু হঠাৎই প্ল্যান্-প্রোগ্রাম সব চেঞ্জ হয়ে গেল জয়ন্তির। মনস্থির করে, দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু সেখানে যে একটি সারপ্রাইজ্ নিউজ ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তা স্বপ্নেও কখনো কল্পনা করতে পারেনি।

উড়ো জাহাজ থেকে অবতড়ণ করে, চেকিং সেড়ে করিডোর দিয়ে বের হতেই চমকে ওঠে জয়ন্তি,-এ কি, শুভেন্দু স্যার্ যে! ওঃ মাই গড্! উনি এইখানে? কি করছেন? উনিও কি কাউকে রিসিভ করতে এসেছেন বুঝি! আশ্চর্য্য!

ইতিপূর্বে সকৌতূক হাস্যে দ্রুত এগিয়ে আসে ওর ছোটবোন মধুবন্তী। হবু জামাইবাবু শুভেন্দুর হাত ধরে বলে,-"শুভষ্য শীঘ্রম দিদি, দ্যাখ্ কে এসেছে! চিনতে পারছিস? তোর মনের মানুষটাকেই নিয়ে এসেছি সঙ্গে! সারপ্রাইজটা কেমন দিলাম বল্ তো!"

যেন আকাশ থেকে পড়ল জয়ন্তি। বিস্ময়ে একেবারে থ্ হয়ে যায়। বড় বড় চোখ মেলে শূন্য দৃষ্টিতে হাঁ করে চেয়ে থাকে। এখনো কি স্বপ্ন দেখছে না কি ও'!

নিজের শরীরে একটা চিমটি কেটে মনে মনে বলে,- হোয়াট এ সারপ্রাইজ বন্তী! এ যে আনবিলিভএ্যবল্, আনথিংকেবল!

বিস্ময়ে এতোটাই অভিভূত হয়ে পড়ল, মুহূর্তের জন্য রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ওর কণ্ঠস্বর। হঠাৎ সশব্দে বলে উঠল,-"মানে! হোয়াট ডু ইউ মিন বন্তী? আর ইউ যোকিং? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না!"

মধুবন্তী বলল,-"ভেরী সিম্পল্ মাই ডিয়ার সিষ্টার। শুভেন্দুদা স্বয়ং নিজে এসে প্রোপোস করেছেন, এ কি কম কথা! ওয়ান্ডারফুল! হী ইস্ এ ভেরী নাইস্ পার্সন দিদি! ইউ আর সো লাকি!"

ততক্ষণে জয়ন্তির সন্নিকটে এগিয়ে এলেন প্রফেসর শুভেন্দু। সহাস্যে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,-"হাউ আর ইউ জয়ন্তি?"

একটু দূরে মাতা সুধাময়ী প্রসন্ন চিত্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জয়ন্তি সলজ্জে দ্রুত এগিয়ে এসে মায়ের বুকে মুখ লুকায়। পরক্ষণেই মুখ তুলে প্রফেসর শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল,-"আই কান্ট বিলিভ ইট্ মাম্! আই কান্ট বিলিভ! আই লাভ ইউ! আই লাভ ইউ সো মাচ্!"

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরোন্ট প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
jbarua1126@gmail.com